ATHENA, VOLUME X, JULY 2026 C.E. (ISSN: 2454-1605), pp. 196-204
www.athenajournalcbm.in

শহীদুল জহিরের গল্প: গ্রাম ও শহরের দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে নিম্নবর্গের সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের সংকট

ড. প্রতাপ ব্যাপারী*

প্রাপ্ত: ০৯.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ২১.০৪.২০২৬ গৃহীত: ২৪.০৫.২০২৬

সারসংক্ষেপ: *বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় শহীদুল জহির এক অনন্য কথাশিল্পী। আশির দশকের কথাকার হিসেবে খ্যাতি পেলেও তাঁর গল্পযাত্রার গোড়াপত্তন কিন্তু তারো আগে, সত্তরের দশকের শেষভাগে। এই সময়ের শিল্পরীতি তাঁর লেখায় ছাপ রেখে গেছে একথা সত্য, তবে যে শহীদুল জহিরকে বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী প্রতিভা বলা হয়, তিনি স্ব-মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন আশির দশকে। লেখক শহীদুল হক থেকে শিল্পী শহীদুল জহির হয়ে ওঠার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ— 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসের প্রকাশ। এ কেবল তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রার নয়, গোটা স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের বাঁকবদলেরও এক ঐতিহাসিক দলিল। সাহিত্যের জগতে দশক-বদলের সঙ্গে শুধু বর্ষপঞ্জির পাতা উল্টে যায় না, শিল্পভাবনাতেও ঘটে টানাপোড়েন। সত্তর ও আশির দশকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শহীদুল জহির সেই বদলের এক বলিষ্ঠ সেতু নির্মাণ করেছেন। তাঁর কলমে স্বাধীন বাংলাদেশ শুধু ভৌগোলিক মানচিত্রের বিষয় হয়ে থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছে এক আত্মপরিচয়ের সন্ধানের পরিক্রমা। ষাটের দশকের কথাশিল্পীরা স্বাধীন দেশের সাহিত্যভুবনের পথপ্রদর্শক হলেও, নতুন সময় তাদের হাতে তুলে দিয়েছে নতুন চিন্তার উপাদান। এ যুগের সাহিত্যিকদের কলমে কখনো রয়ে গেছে পূর্বসূরিদের রেশ, কখনো বা জেগে উঠেছে নবজাগরণের সুর। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে শহীদুল জহির আবির্ভূত হলেন তাঁর অনন্য ভাষাশৈলী, আঙ্গিকের নতুনত্ব এবং সমাজবাস্তবতার গভীর পর্যবেক্ষণ নিয়ে। নতুন দেশের নতুন সাহিত্যে তিনিই যেন এক নীরব বিপ্লবী, যিনি পুরাতনের সঙ্গে নতুনের যোগসূত্র ঘটিয়ে গড়ে তুললেন এক অন্যতর আখ্যানজগৎ।*

সূচক শব্দ: *শ্রেণি সচেতনতা, গ্রাম-নগরের দ্বন্দ্ব, মুক্তিযুদ্ধ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, মধ্যবিত্ত, জাদু-বাস্তবতা, সামরিক শাসন, প্রতিবাদ।*

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: pratapbapari@gmail.com

সময়ের স্রোতে ভেসে চলা শিল্পী-সাহিত্যিক কখনোই তাঁর যুগের ছায়া এড়িয়ে যেতে পারেন না; তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি যেন এক বিশেষ আলোকপ্রভায় সেই যুগের জীবনীশক্তিকে ধারণ করে। শহীদুল জহির সেই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কথাশিল্পী, যিনি সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর নিজস্ব বোধ ও নৈপুণ্যে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পে যে শ্রেণির মানুষের জীবন উঠে এসেছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই জীবনচিত্র আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে। ফলে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ নিছক যাত্রা নয়, বরং ছিল এক পরিণত প্রস্তুতির ফল। শহীদুল জহিরের সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে নগরের জটিল জীবন থেকে শুরু করে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চলমানতা, নতুন ঢাকার মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞান, নগরে আশ্রয় নেওয়া উন্মুল মানুষের সংগ্রাম এবং গ্রামের কৃষিজীবী ও ছদ্ম-সামন্তীয় শোষণব্যবস্থার দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা।

শহীদুল জহিরের সাহিত্যিক পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভিন্নধর্মী গল্প বলার ভঙ্গি। এই স্বাতন্ত্র্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একটি গভীর অনুভবী দৃষ্টি, যা তাঁর সময়ের অন্য কথাকারদের থেকে তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পারাপার' (১৯৮৫)-এর প্রকাশকালীন নাম ছিল শহীদুল হক। রচনার উপকরণ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই নিম্নবর্গীয় জীবনের খণ্ডচিত্র, যেগুলো সাধারণত সাহিত্যে অবহেলিত থাকে। 'পারাপার' গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পেই আমরা পাই সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের প্রতিধ্বনি। এই মানুষগুলো যে সমাজের মূল স্রোতের বাইরে পড়ে থাকে, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা—হাসি, কান্না, স্বপ্ন, বঞ্চনা—সবকিছুই শহীদুল নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই গল্পগুলোতে বস্তিজীবনের চালচিত্র, যেখানে ধূলি আর দারিদ্র্য হাত ধরাধরি করে চলে, সেখানে শহীদুলের কলম থেমে থাকেনি। তাঁর রচনায় সেই জীবনের এমন সব সূক্ষ্ম শিরায় শিরায় আলো পৌঁছেছে, যেগুলো সাধারণ সাহিত্যিকের চোখ এড়িয়ে যায়। এমন এক গভীর দৃষ্টির সাহচর্যে 'পারাপার'-এর প্রতিটি গল্প কেবল নিম্নবর্গীয় জীবনের বিবরণ নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে জীবনের উদ্‌ঘাটনের এক অনন্য শিল্পকর্ম। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শহীদুল জহির জানাচ্ছেন—

> "পারাপার-এর সবগুলো গল্পই দেখবেন প্রতিবাদী ভালোবাসা বাদে। অন্য সবগুলোতেই আপনি দেখবেন যে তারা প্রতিবাদ করে।"[১]

শহীদুল জহিরের 'ভালোবাসা' গল্পটি এক টুকরো জীবনের আখ্যান। আবেদা ও হাফিজদ্দির দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসার জীবনের একদিনের ঘটনাপ্রবাহেই ফুটে উঠেছে নিম্নবর্গীয় মানুষের সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং তাদের মানসিক টানাপোড়েন। শহিদ দিবস উপলক্ষে চারদিকে ফুল ছিঁড়তে দেখে হাফিজদ্দি একটি ডালিয়া ফুল ছিঁড়ে আনে। তার ইচ্ছা, ফুলটি বোতলে জলে ভিজিয়ে ঘরে রেখে দেবে। এই সাধারণ কাজই হয়ে ওঠে গল্পের কেন্দ্রীয় ঘটনা। ফুলটি নিয়ে আবেদা, হাফিজদ্দি এবং তাদের একমাত্র কন্যা তহুরার ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া গল্পের মূল সুরটি বেঁধে রাখে। ফুলটি গাছ থেকে ছেঁড়া হয়েছে, তাই শুকিয়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যতক্ষণ ফুলটি সতেজ, ততক্ষণ তাকে ঘিরে তৈরি হয় এক চিত্ররূপময় আবেগ। হাফিজদ্দি ফুলটিকে রেখে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে গেলে আবেদার মনে জেগে ওঠে নিজেকে সাজানোর আকাঙ্ক্ষা। নারীসুলভ সৌন্দর্যবোধ তাকে তাড়িত করে ফুলটিকে চুলের খোঁপায় গুঁজে নিতে। কিন্তু স্বামীর ভয়ে সে ফুলটিকে যথাস্থানে রেখে দেয়। হাফিজদ্দি ফিরে এসে বোতলের বাইরে ফুল দেখে বুঝতে পারে, আবেদা তা ব্যবহার করেছিল। প্রথমে বিরক্ত হলেও হঠাৎ করেই বলে ওঠে—"ফুলটা তরে দিয়া দিলাম যা।"[২] এই আকস্মিক উপহার আবেদার কাছে হয়ে ওঠে বিরল। একটি নিদারুণ অভাবের সংসারে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সামান্য ফুলের এই উদারতাও তার মনে এনে দেয় এক গভীর সুখ। গল্পকার এই অনুভূতিকে বর্ণনা করেছেন হৃদয়স্পর্শীভাবে—

> "আবেদার বুকের ভেতরটা কেঁপেছিল কী এক সুখে। হঠাৎ-ঝরা বৃষ্টির পর পোড়া চরাচরের মতো আবেদার মনে হয় কী আরাম বৃষ্টির এই অনাবিল জলে ভেজায়।"[৩]

এরপর তহুরা ফুলটিকে নিজের খেলনার বিকল্প হিসেবে দাবি করে। শিশুমনের এই সরল আকাঙ্ক্ষা গল্পে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। গল্পের কেন্দ্রে থাকা ফুলটি যেন দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের ক্ষণিকের আনন্দ, যা সকলের কাছে মূল্যবান। 'ভালোবাসা' নামটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতার প্রকাশ নয়, নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনসংগ্রামের মধ্যেও পাওয়া যায় এমন মুহূর্ত, যা তাদের গতানুগতিক বঞ্চনার মধ্যে আশার আলোকরশ্মি হয়ে ওঠে।

'তোরাব সেখ' গল্পটি এক জাগতিক পরাজয়ের আখ্যান। এখানে তোরাব সেখ কেবল একটি চরিত্র নয়, বরং আত্মমর্যাদা, পরনির্ভরতা, এবং অস্তিত্বের লড়াইয়ে জর্জরিত মানুষের এক প্রতীক। বৃদ্ধ তোরাব সেখ, বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তবু তার ভেতরের আত্মসম্মানবোধ তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। গল্পের সূচনা হয় তীব্র গ্রীষ্মের বিরূপ পরিবেশে, যেখানে বস্তির সকলেই উপার্জনের তাড়নায় বাইরে গেছে, আর বুড়ো তোরাব সেখ পড়ে রয়েছে ফাঁকা বস্তিতে। সে তার দিনযাপনে স্পষ্ট উপলব্ধি করে নিজের অস্তিত্বহীনতা।

"তোরাবের খারাপ লাগে রোগে কাতর বুড়ো হওয়ার জন্য।"[৪]

এই এক পঙক্তিতেই ফুটে উঠেছে তার বেদনা। তোরাবের আত্মমর্যাদাবোধ গল্পটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কন্যা লালবানুর কানের দুল দেখে তার সন্দেহ হয়। সে বলে ওঠে—

"চুরি করস নাই তো?"[৫]

এ কথা বলেই সংসারে অশান্তি ডেকে আনে তোরাব। তার এই সন্দেহ, যদিও অপ্রিয়, ছিল জীবনের প্রতি তার সততার প্রকাশ। জীবনের পরবর্তী অংশে, এই একই আত্মসম্মান তাকে ঠেলে দেয় এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যে। নিজামের সঙ্গে উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া তোরাবের দিনগুলো ছিল অমানুষিক শ্রমে পূর্ণ। সামান্য অর্থ উপার্জন করে তা সংসারে দিতে পেরে যে আনন্দ সে অনুভব করে—

"এই দুর্দিনে সংসারে কয়েকটি টাকা যোগ করতে পারায় ওর মনে তৃপ্তির একটা ফল্গুধারা বয়ে যায়।"[৬]

তবু তোরাব সেখের আত্মসম্মান তাকে তার মেয়ে লালবানুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আপস করতে দেয় না। লালবানুর জন্য মজিদের মতো এক স্ত্রী-পরিত্যক্ত পুরুষকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে সে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ো কঠিন— পরনির্ভরশীল বৃদ্ধ তোরাবের মতামত তার পরিবারের কাছে তুচ্ছ। লালবানু মজিদের সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে। এই ঘটনা তোরাব সেখের হৃদয়ে চূড়ান্ত আঘাত হানে। সে গৃহত্যাগ করে, যেন তার অস্তিত্বহীনতার সত্যিকারের প্রতীক হয়ে ওঠে। গল্পের অন্তিম প্রান্তে, তোরাবের অনুপস্থিতি যেন জীবনের নিঃসঙ্গ পরিণতির ইঙ্গিত দেয়—

"তোরাবের দেখা নাই ...দিনের প্রান্তে রাত এসে দাঁড়ায় ...তোরাব আসে না।"[৭]

'তোরাব সেখ' তাই শুধু একটি বৃদ্ধের অস্তিত্ব হারানোর গল্প নয়। এটি একজন মানুষের আত্মমর্যাদার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও সমাজের প্রতিকূলতায় পরাজিত হওয়ার অনিবার্য বাস্তবতার চিত্র। গল্পটি পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে এক গভীর বিষাদ, উপলব্ধি করিয়ে দেয় নিজেদের অস্তিত্বের লড়াই।

'মাটি এবং মানুষের রং' গল্পটি শহীদুল জহিরের এক ভিন্ন প্রয়াস, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উদ্ভূত বর্ণবৈষম্য এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বকে কেন্দ্রীয় উপজীব্য করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ ছায়া ভারতীয় সমাজে গাত্রবর্ণের প্রাধান্যের যে সংস্কার বদ্ধমূল করেছিল, সেই প্রভাবেই এই গল্পের সুর নির্মিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই গ্রামের মেয়ে আম্বির বিবাহোত্তর পিতৃগৃহে আগমনের মধ্যে দিয়ে কাহিনির বুনোট শুরু হয়। পরিচিত পরিবেশে ফিরে গিয়ে আম্বি একে একে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এভাবেই সে পৌঁছে যায় আসিয়া খাতুনের বাড়িতে, যে একসময় তার পুত্র মালেকের সঙ্গে আম্বির বিবাহের কথা ভেবেছিল। কিন্তু কেবল গায়ের রঙ কালো এবং দরিদ্র পিতার কন্যা হওয়ার কারণে আম্বিকে প্রত্যাখ্যান করে আসিয়া খাতুন। বরং তিনি তার পুত্রবধূ হিসেবে বেছে নেন ফরসা রঙের ময়নাকে। গল্পকার জানাচ্ছেন—

"আসিয়া খাতুনের আসলে একটা হিসাব ছিল। তার বংশের সকলে কালো। ...তাই এমন একটি ছেলে বউয়ের প্রয়োজন ছিল, যে ফুটফুটে একটা ছেলে বিয়োবে। ...তাই মালেকের বউ হয়ে এসেছিল ময়না। ময়না সুন্দরী এবং ফরসা।"[৮]

কিন্তু জীবনের এই অদ্ভুত পরিহাস— ময়নার পুত্রও হয় কালো। এটি যেন আসিয়া খাতুনের মানসিক সংকীর্ণতাকে এক প্রচ্ছন্ন চপেটাঘাত করে। গল্পে চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত আসে, যখন একসময়ের উপেক্ষিতা আম্বির ফরসা পুত্র ফজুকে নিয়ে হারুর মা প্রশংসা করেন। এই প্রশংসা যেন আসিয়া খাতুনের মানসিক দহনকে বিষাক্ত ঈর্ষায় রূপান্তরিত করে। তার আঘাত ও ক্রোধ লক্ষ করে আম্বির দিকে—

> "আসিফা খাতুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটু আগে তিনি নিজের নাতির নিন্দা করেছেন। ফলে হারুর মার কথাটা তার মনের তল পর্যন্ত চলে গেল। সেখানে একটা ক্ষোভের পাত্র ছিল। হারুর মার কথায় সেটা হঠাতই ভেঙে পড়ল। আর তখন সেখানে সঞ্চিত ক্ষোভ রাসায়নিক কোনো এক বিক্রিয়ায় বিষে পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো আম্বির ওপর। ফজুকে কোলে তুলে নিয়ে অত্যন্ত সহজ স্বরে বললেন, ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়।"[৯]

আসিয়া খাতুনের এই আচরণ এক সংকীর্ণ বর্ণবিদ্বেষী সমাজের প্রতীক, যেখানে গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়। আম্বির ফরসা পুত্র যেন এই বৈষম্যমূলক ধারণার বিপরীতে এক প্রতীকী বিজয়। গল্পটি নিছক বর্ণবৈষম্যের কাহিনি নয়; এটি মানুষে মানুষে বিভেদের সামাজিক সংকটকে তুলে ধরেছে। গায়ের রং কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানসিক সংকীর্ণতা এবং এর ফলে সৃষ্ট হতাশা ও অবনমন এখানে জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। 'মাটি এবং মানুষের রং' তাই শুধু ব্যক্তি আসিয়া খাতুনের নয়, বরং এক জটিল, বর্ণবিদ্বেষী সমাজের মর্মস্পর্শী চিত্র।

'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯৯) শহীদুল জহিরের সাহিত্যজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে ভাষা ও শৈলীতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আগের গ্রন্থ 'পারাপার'-এর তুলনায় এই গ্রন্থে তিনি বিষয়বিন্যাস এবং ভাষার কৌশল প্রয়োগে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। লেখকের নিজস্ব শিল্পচেতনার অভ্যন্তরীণ উত্তরণ এবং ভাষাভঙ্গির নান্দনিক রূপান্তর এই গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়। জহির নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'পারাপার'-এর পরবর্তী সময়ের লেখালেখিতে ভাষাভিত্তিক ও চিন্তার গভীরতায় একটি বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প'-এ জহিরের ভাষা হয়ে উঠেছে আরও প্রাঞ্জল, সংবেদনশীল এবং বহুমাত্রিক। গল্পগুলোতে তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রায়ণের পাশাপাশি সমাজের অন্তর্লীন বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি গল্পে সমাজ, রাজনীতি এবং ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটেছে, তা সূক্ষ্ম শৈলীতে উঠে এসেছে জহিরের গল্পগুলিতে। এই গ্রন্থের গল্পগুলো তাঁর সাহিত্যিক পরিপক্কতার উদাহরণ, যেখানে বিষয়বস্তু এবং ভাষা একটি নতুন ঐক্যের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে। ফলে, 'ডুমুর খেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' কেবল গল্পের সংকলন নয়, এটি শহীদুল জহিরের শিল্পসত্তার আত্ম-অন্বেষণের মাইলফলকও বটে।

শহীদুল জহিরের গল্প 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' নগরজীবনের সীমাবদ্ধ পরিসরে মানবিক অস্তিত্বের সংকট ও একাকিত্বের গভীর অনুধ্যান। আবদুস সাত্তার চরিত্রটি এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দু, যে একজন চাকুরে হলেও তার একাকিত্ব এবং ব্যক্তিক বলয়ে সৃষ্ট নিজস্ব জগতের প্রতীক। গল্পটি মানুষের আত্মমগ্নতার জালে বন্দি হওয়া এবং সেই জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি নিয়ে গভীর এক আলেখ্য। গল্পের সূচনা হয় আবদুস সাত্তারের অফিস থেকে ফেরার বর্ণনায়। সে এমন এক ব্যক্তি, যার জন্য তার বাসার সামনের ছোটো ব্যালকনি তার একান্ত আশ্রয়স্থল। পরিবারের ভিড়ে থেকেও সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, নিঃসঙ্গ এক দুনিয়া গড়ে তুলেছে যেখানে তার সঙ্গী কেবল তার ব্যালকনির গাছপালা। কিন্তু কাহিনির গতি পরিবর্তন হয় সাত্তারের আকস্মিক মৃত্যুতে। ভূমিকম্পের সময় দুটি নয়নতারা গাছ রক্ষা করতে গিয়ে সে ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারায়। এখানেই গল্পটি গভীর প্রতীকী রূপ নেয়। নয়নতারা গাছের প্রতি তার যে মমত্ব, তা যেন তার নিঃসঙ্গ জীবনের অব্যক্ত বেদনারই প্রতিফলন। তার মৃত্যু কেবল একটি ব্যক্তির মৃত্যু নয়, বরং তা হয়ে ওঠে তার নিজের গড়ে তোলা জগতের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত। গল্পের সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশ হলো, সাত্তারের মৃত্যুর পর নয়নতারা গাছের সঙ্গে কলোনির প্রাণবৈচিত্র্যের অদ্ভুত সম্পর্ক। নয়নতারা গাছগুলো যেন সাত্তারের মৃত্যুকে ধারণ করে তার স্মৃতিকে অমর করে তোলে। ব্যালকনির নয়নতারা গাছগুলো আর বাঁচতে চায় না, যেন তারা সেই স্থানকে এক অভিশপ্ত মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। গল্পের শেষে এই গভীর সংবেদনশীলতা ও প্রতীকবোধের মাধ্যমে শহীদুল জহির প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নয়নতারা গাছ ও সাত্তারের একাকিত্বের পরস্পর সম্পর্ক একটি উচ্চতর মানবিক অর্থ বহন করে। শহীদুল জহির গল্পের এই আখ্যানের মাধ্যমে এক নিঃসঙ্গ নগরজীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে পাঠককে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছেন।

জীবনকে যাপনের সঙ্গে গল্প বলে যাওয়ার রীতি যে কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তা শহীদুল জহিরের

'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্পে প্রতিভাত। 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' শিরোনামটিতে কিশোরপাঠ্যের সরল রূপকথার ছায়া দেখা যায় বটে, কিন্তু গভীরে লুকিয়ে থাকে জাদুবাস্তবতার চমকপ্রদ ঝলক। এখানে রূপকথার সরলতা, বাস্তবতার কঠোরতা আর অলৌকিকতার এক অভাবনীয় মিশ্রণ দেখা দেয়। গল্পের কেন্দ্রে আছেন আকালু নামের এক দরিদ্র কাঠুরে এবং তার স্ত্রী টেপি। গ্রামীণ জীবনের তাদের সাদামাটা সংসার একদিন বদলে যায় এক অদ্ভুত অতিথির আগমনে। সেই অতিথি আর কেউ নয়, একটি দাঁড়কাক। এমনকি প্রথম দিনেই এই কাক তাদের জন্য বয়ে আনে এক প্রকার 'শুভ সংকেত'। পুরনো গাছের গুঁড়ি উৎপাটনের কাজ করতে গিয়ে আকালু একটি অজানা মুদ্রার ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। এই আকস্মিক ঘটনাটি আপাতত ভালো ঠেকে, কিন্তু কাক যে তাদের জীবনের পরিণতিকে অদ্ভুত এক পথে নিয়ে যাবে, তা তারা তখনো বুঝতে পারেনি। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের শান্ত জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। টাকাগুলো নিয়ে ঘটে যায় নানা কাণ্ড। ডাকাতি, মিথ্যা মামলা, আর অপমানের জ্বালায় আকালু তার গ্রাম ছেড়ে ঢাকার গুলিস্তানে পাড়ি জমান। এখানে জীবনের আরেক রূঢ় রূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে, সেই পুরোনো দাঁড়কাকটি আবার তাদের সঙ্গী হয়। এইবারও কাক তাদের জীবনে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটায়। তবে শহুরে জীবনের স্বরূপ এখানেও তাদের একা ছাড়ে না— ভাগ্য বদলানোর জন্য আকালু যখন এক জ্যোতিষের শরণাপন্ন হন, তখন মিথ্যা দোষারোপের কারণে সে জেলও খাটে। গল্পের শেষ অংশে দাঁড়কাক কেবল এক অলৌকিক শক্তি নয়, বরং আকালু আর টেপির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। তাদের জন্য বাঁশের মাচা বানানো থেকে শুরু করে নিজের ডিম দেওয়া, কাক যেন প্রতিমুহূর্তে তাদের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে। অথচ মানুষের লোভ এবং স্বার্থপরতা সেখানে ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্র আর লোভের আগুনে যখন আকালুদের জীবনের শেষ আশ্রয়টুকুও পুড়ে যায়, তখনই সেই দাঁড়কাক আশ্চর্য রক্ষাকর্তার ভূমিকায় হাজির হয়। গল্পকারের ভাষায়—

> "যখন নৌকার মাঝিরা নৌকার পাটতনের উপর চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকে গল্প করছিল তখন তারা একসময় দেখে... পাখিরা কী যেন মুখে করে শূন্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রথমে তাদের কাছে মনে হয় যেন দুটো কাপড়ের টুকরো, কিন্তু তারপর পশ্চাৎপটে আকাশের আবছা আলোয় উড়ন্ত পাখিদের ভিড়ে তারা দুটো মানুষের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখে। এই কালো পাখিরা রামপুরার ঝিলের উপর দিয়ে ধলেশ্বরীর কুয়াশার ভেতর উড়ে যায়।"[১০]

এই গল্প শুধু অলৌকিকতার কারণে নয়, বরং জীবনের গভীর বাস্তবতার সঙ্গে সেই অলৌকিকতাকে মিশিয়ে দেওয়ার কারণে অনন্য। আকালু ও টেপির প্রতি কাকের অদ্ভুত আনুগত্য, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের এক নীরব চিত্র, গল্পটিকে প্রথাগত বৃত্ত থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। এভাবে গল্পের রূপক আর জাদুবাস্তবতার উপস্থাপনা এক সরল অথচ গভীর শৈলী তৈরি করে, যা পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে।

'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পে শহীদুল জহির মানবসভ্যতার একটি চিরকালীন অসুখের পরিচয় দিয়েছেন, তা হলো ভোগলিপ্সা ও তার প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত অপূর্ণতার হাহাকার এবং নির্মম পরিণতি। জাদুবাস্তবতার সূক্ষ্ম রঙ দিয়ে আঁকা এই গল্পে মোহাব্বত আলি জাদুগির নামক এক রহস্যময় ব্যক্তির আবির্ভাব, যার মায়াময় ডুমুর ফলের জাদু এক আশ্চর্য মোড় এনে দেয় সাধারণ মানুষের জীবনে। গল্পের সূচনাই যেন এক গূঢ় বার্তা দেন জহির—

> "তার মুখে একটি রহস্যময় হাসি ঝুলে ছিল।"[১১]

এই হাসির আড়ালেই লুকিয়ে ছিল এক জাদুকরের চাতুর্য ও মানুষের সহজ-সরল চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণের কারসাজি। মোহাব্বত আলির আসল অভিপ্রায় ছিল একটাই— ডুমুর ফলের প্রতি মানুষের চাহিদা ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি। প্রথমে এই ফল বিক্রি করত সুলভ মূল্যে, যেন মানুষের মধ্যে তার প্রতি আসক্তি জন্মায়। তারপর, ঠিক ব্যবসায়ীসুলভ কৌশলে, চাহিদা যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন সে বাড়িয়ে দেয় ডুমুর ফলের দাম। শেষমেশ, যখন ডুমুরের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রবল কিন্তু সরবরাহ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তখন মোহাব্বত আলি রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যায়। এদিকে, যারা এই জাদু ডুমুরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল, তারা দিশেহারা হয়ে খুঁজতে থাকে সেই যোগানদার জাদুকর মোহাব্বত আলিকে। একসময় তারা পৌঁছে যায় তার প্রাসাদে, যেখানে তারা নিজেরাই ডুমুর গাছ কেনার আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়। কিন্তু জাদুকর

যখন তাদের এই চাহিদা পূরণে অপারগ হয়, তখন তাদের মনের গভীরে জমতে থাকা অসন্তোষ ও ক্ষোভ পরিণত হয় হিংসায়। মোহাব্বত আলিকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। কিন্তু গল্পের অন্তিম অধ্যায়ই যেন প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করে। নিজেরা এই অপ্রাপ্তির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তারা হারায় স্বাভাবিক জীবনযাপনের চিহ্ন। গল্পকার বলেন—

"পাঁচটি বাড়িতে বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখে।"[১২]

মোহাব্বত আলিই এই ভোগ-লিপ্সার জাদু দিয়ে তাদের কেবল ডুমুরখেকো মানুষই নয়, অবশেষে হাড়ে পরিণত করেছিল। এই গল্পের গভীরে লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন সত্য। এটি কোনো রূপকথা নয়, বরং এটি ভোগবাদী সভ্যতার নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি। হাড় এখানে হয়ে উঠেছে ভোগসর্বস্ব বেনিয়া মানসিকতার কঙ্কালসার পরিণতির প্রতীক। জহির আমাদের দেখালেন, কীভাবে একটি অসীম লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এবং শেষে, সেই হাড়ের স্তূপের মধ্যেই আমরা দেখি এক নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস।

জীবন এক বিশৃঙ্খল পাঁজরখচিত কাঠামো, যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার এক টুকরো আকাশ খুঁজতে ব্যর্থ হয়। আব্দুল করিম নামের এক মধ্যবয়সী, নিঃসঙ্গ মানুষ, তার নিজের ঘর-গৃহস্থালি নিয়ে এক অদ্ভুত প্রাত্যহিকতাকে আঁকড়ে ধরেছে 'চতুর্থ মাত্রা' গল্পে। শহরের অগণিত কোলাহলের মাঝে দাঁড়িয়ে, করিম যেন এক নীরব দ্বীপ, যাকে কেউ ছুঁতে আসে না। শহীদুল জহির তাঁর গল্পে করিমের এই বিচ্ছিন্নতাকে নাটকের নানা স্বাদে রঙিন করে তুলেছেন। তার জীবন যেন একটি একাঙ্ক নাটকের মঞ্চ। প্রতিদিন সংবাদপত্র বিক্রির অজুহাতে ফেরিওয়ালার সঙ্গে দর-কষাকষি করা, কিংবা না থাকলে নিজেই সংবাদপত্র কিনে তার সঙ্গে সময় কাটানো— এগুলো করিমের কাছে কোনো অর্থহীন অভ্যাস নয়। এগুলোই তার গতানুগতিক জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর মূলমন্ত্র। ঘরের ভাঙা গ্লাসগুলো যেন করিমের একাকিত্বের প্রতীক। সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দরজার বাইরে রেখে দেওয়া— মহল্লার ছেলেদের হট্টগোল শোনার অপেক্ষা করা। হয়তো কেউ ডাকবে, হয়তো কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে। আর না ডাকলেও, সে অন্তত এই ভাঙা গ্লাসগুলোর মধ্যে দিয়ে জীবনের কোনো এক ক্ষুদ্র সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। স্বপ্নেও করিমকে দেখা যায় নানা অসংলগ্ন বাক-বিতণ্ডায় জড়িত হতে। তার চেতনার প্রবাহে কোথাও এক নির্মম বিরহ, এক অস্ফুট আর্তনাদ রয়ে যায়। নাগরিক জীবনের এই একঘেয়েমি এবং নিঃসঙ্গতা তার চারপাশের ব্যস্ততার বিপরীতে এক গভীর ছায়া ফেলে। করিম যেন নাগরিক ব্যস্ততায় এক নির্বাসিত আত্মা। শহীদুল জহিরের এই গল্পটি কেবলমাত্র এক ব্যক্তির আখ্যান নয়। এটি যেন এক সামগ্রিক চিত্র— যেখানে শহরের প্রাণহীন ভবন আর মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায় একাকিত্বের আর্তনাদ। করিমের প্রতিটি আচার-আচরণ, তার অপ্রাপ্তি আর ব্যর্থতাগুলো আমাদের চিনিয়ে দেয় সেই নিঃসঙ্গ মানুষের কথা, যাকে আমরা প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে অবহেলায় এড়িয়ে যাই। গল্পের পরতে পরতে লেখক যেন নিজেকে এক নৈঃসঙ্গ্যের আয়নায় দেখতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জটিলতাকে কেন্দ্র করে লেখা 'ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প' (২০০৪) গ্রন্থটি এক অনন্য আখ্যানমালা। আলোচ্য গল্প-সংকলনে যেমন স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশের জনগণের অন্তর্লীন সংকটের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তেমনি এখানে বিশ্ব-রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নির্মম বাস্তবতাও উঠে এসেছে। গ্রাম ও শহরের বিপন্ন ও বৈপরীত্যপূর্ণ ছবি, জীবনের গভীর সংকট আর মানবিক টানাপোড়েন— এই সবকিছুই জহির গল্পগুলিতে জুড়ে দিয়েছেন অনন্য শিল্পকলায়। গল্পগুলির ভাষা ও উপস্থাপনায় জহিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নাগরিক প্রমিত ভাষার শৃঙ্খল ভেঙে দৈনন্দিন জীবনের প্রাণবন্ত সংলাপের ব্যবহার। এতে তিনি গল্পগুলিকে কেবল প্রাণময় করে তোলেননি, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাকেও ছুঁয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্প যেন পাঠককে নিয়ে যায় সেইসব পটভূমিতে, যেখানে ভাষার লৌকিক সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। গল্পগুলিতে লোকভঙ্গির উপস্থিতি কেবল ভাষিক রূপায়ণ নয়, বরং এর মাধ্যমে তিনি সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবনের অন্তর্গত বেদনা, শোষণ ও বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

'আমাদের বকুল' এই কৌশলের উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে গ্রামীণ জীবনের সরল বিশ্বাস, নারীর অবস্থান এবং

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্বকে প্রতীক ও রূপকের মধ্যে দিয়ে বাঙ্ময় করে তোলা হয়েছে। গল্পের শুরুতে আকালু শেখের বিয়েতে পাওয়া একটি গাভীর প্রসঙ্গ দিয়ে লেখক এমন এক সমান্তরাল আখ্যান বুনেছেন, যেখানে আকালুর স্ত্রী ফাতেমা এবং সেই গাভী একই রকম ভাগ্য বহন করে চলে। গর্ভধারণ, জমজ সন্তান জন্মদান, এবং শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া—ফাতেমা ও গাভীর জীবনের এই ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ যেন সমাজের নারীর অবস্থান ও গৃহপালিত প্রাণীর মূল্যায়নের প্রতীকী রূপ। ফাতেমার ছেলে ও মেয়ে আমির হোসেন ও বকুল তাদের মায়ের প্রত্যাবর্তনের আশায় বিচিকলার গাছ রোপণ করে, যার জীবনকাল তাদের মায়ের জীবনের ইঙ্গিতবাহী। শিশুসুলভ সরলতায় তারা আশাবাদী থাকে। কিন্তু গ্রামের সমাজ জীবনে ফাতেমার অনুপস্থিতি কিংবা তার কন্যা বকুলের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা কোনো বড়ো আলোড়ন সৃষ্টি করে না। গল্পটি এখানেই মোড় নেয়। বকুলের হারিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন গ্রামীণ প্রান্তিক নারীদের অবস্থা, যাদের জীবনের মূল্য সমাজে গৃহপালিত প্রাণীর চেয়ে বেশি নয়। আকালু ফাতেমাকে ভুলে গিয়ে সখিনাকে বিয়ে করে এবং পুনরায় যৌতুকস্বরূপ একটি গরু নিয়ে আসে। এই প্রতীকায়নে নারীর মূল্যায়ন এবং তার অস্তিত্বের প্রতি সমাজের উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে। বকুলের হারিয়ে যাওয়া আসলে তার হারিয়ে যাওয়া নয়; সে গ্রাম্য প্রভাবশালী পুরুষতন্ত্রের লালসার শিকার। গল্পে রূপকের ব্যবহারে জহির এ বাস্তবতাকে মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন—

> "পরদিন সকালে গ্রামের যারা আকালুর ভিটার পেছন দিকে যায় তারা বিচিকলার ঝোপের কাছে বকুলের রক্তাক্ত শাড়ি পড়ে থাকতে দেখে; সুহাসিনীর লাল পিঁপড়া বকুলকে খেয়ে যায়।"[১৩]

এই লাইনটি শুধু বকুলের মৃত্যুর ইঙ্গিতই দেয় না, বরং ভোগবাদী সমাজে প্রান্তিক নারীদের চরম অসহায়ত্ব ও সমাজের নির্মমতায় তাদের ক্ষয়ে যাওয়ার বাস্তবতাকেও রূপময় করে তোলে। শহীদুল জহিরের এই গল্প শিল্প ও জীবনের এক গভীর সমন্বয়। গ্রামীণ লোকবিশ্বাস, সরলতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুর বাস্তবতা, এবং নারীর প্রতি সমাজের উদাসীন মনোভাব—সবই এখানে এক অভূতপূর্ব শিল্পকুশলতায় ফুটে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে 'মহল্লায় বান্দর, আবদুল হালিমের মা এবং আমরা', 'ইন্দুর বিলাই খেলা' গল্পে। 'মহল্লায় বান্দর, আবদুল হালিমের মা এবং আমরা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার এক সূক্ষ্ম চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গল্পে মানুষের জীবনের ভঙ্গুরতা, ভালোবাসার অপমৃত্যু এবং যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক অরাজকতার বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে এক ধরনের রূপকধর্মী আঙ্গিকে। 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার একটি গভীর ও নির্মোহ প্রতিফলন। গল্পটি একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসনের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে তেমনি এর প্রতীকী মাত্রায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের চিরন্তন চক্রকেও ব্যাখ্যা করেছে। গল্পে ভূতের গলি নামক এক মহল্লার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে হানাদার সেনাবাহিনী এবং রাজাকারদের নিষ্ঠুর তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাযজ্ঞ সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহায় ইঁদুরের মতো করে তুলেছে। গল্পকার অত্যন্ত নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের সহযোগী রাজাকাররা মানুষের জীবন নিয়ে খেলেছে, যেন তারা ইঁদুর-বিড়ালের এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে। গল্পকারের ভাষায়—

> "টিপু সুলতান রোডের মোড়ে মিলিটারির ট্রাক থামার সঙ্গে সঙ্গে মহল্লায় খবর হয়ে যায়; মিলিটারি যখন পায়ে হেঁটে ভূতের গলির ভেতর ঢোকে মহল্লার লোকেরা গাঁট্রি-বোঁচকা মাথায় করে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভেগে যায়।"[১৪]

এই অনিবার্য পালিয়ে বেড়ানো এবং জীবনের নিরাপত্তাহীনতা যেন অসহায় মানুষের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে লেফটেন্যান্ট শরিফের মতো সামরিক কর্মকর্তাদের উল্লাস এবং প্রতাপ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরন্তর জীবন রক্ষার চেষ্টাকে গল্পকার এমনভাবে তুলনা করেছেন, যা মানুষের নৈর্ব্যক্তিক অসহায়ত্বকে প্রকট করে তুলেছে। গল্পে ইঁদুর এবং বিড়াল শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ের শক্তিমান-দুর্বলের সম্পর্কের প্রতীক নয়; এটি একটি চিরন্তন প্রতীক, যা সামাজিক ও

রাজনৈতিক বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। সমাজ সৃষ্টির কাল থেকেই আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক শক্তিমান শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, দুর্বল পরিণত হয়েছে শোষকে। এই শাসক-শোষকই কালের নিয়মে বিড়াল এবং ইঁদুরে পরিণত হয়েছে। গল্পকার এখানে দেখিয়েছেন, মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে শক্তিমান এবং দুর্বলের সম্পর্কটি বারবার এই ইঁদুর-বিড়াল খেলার পুনরাবৃত্তি করেছে। শেষপর্যন্ত এটি কেবল মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি মহল্লার নয়, বরং হয়ে ওঠে মানব ইতিহাসের অসাম্যের গল্প।

'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পটি প্রেম, প্রতারণা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক বাস্তবতার এক অনন্য রূপায়ণ। লোকবিশ্বাসের অলৌকিকতার সাথে মানব সম্পর্কের জটিলতাকে মিশিয়ে একটি রহস্যময় আখ্যান গড়ে তুলেছেন লেখক। তৈমুর আলি চৌধুরী ও সমর্তবানুর দাম্পত্যজীবন এই গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শর্ত ও সন্দেহের ভিত্তিতে, যা গল্পটিকে এক অপার্থিব গাম্ভীর্য প্রদান করেছে। তৈমুর আলি ও সমর্তবানুর দাম্পত্যজীবনে প্রতিদিনের জীবন-মরণ খেলার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা একদিকে প্রেমের প্রতি অবিশ্বাস, অন্যদিকে প্রতিশোধস্পৃহাকে নির্দেশ করে। দুটি পানীয়ের একটিতে বিষ মিশিয়ে দৈনন্দিন জীবনের অস্থিরতা ও সংশয়ের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ককে মেলে ধরেছেন লেখক। সারাজীবন এই সংশয় এবং দোলাচলচিত্ততার মধ্যেই কাটাতে কাটাতে শেষ বয়সে তৈমুর আলি চৌধুরীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তা ঠিক হীরেমিশ্রিত বিষ প্রয়োগে কিনা, তা ঠিক জানা যায় না। এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব শুধু দাম্পত্য নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও মানসিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন। গল্পের সমাপ্তি অংশে হীরের আংটি আসলে কাচের টুকরো হয়ে উঠে আসে প্রতীক হিসেবে। এটি সমর্তবানু ও তৈমুর আলির সম্পর্কের ভঙ্গুরতা এবং কৃত্রিমতাকে প্রকাশ করে। এই প্রতীকটি কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কগুলোর ভণ্ডামি ও ভঙ্গুরতার একটি অসাধারণ উপমা। সমর্তবানুর পিতৃভূমি আলিকদমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি একদিকে তার নিজের পরিচয় ও শিকড়ে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, অন্যদিকে তৈমুর আলি চৌধুরীর প্রতাপশালী জীবনের উপর তার চূড়ান্ত বিজয়ের ইঙ্গিত। 'ডলু নদীর হাওয়া' তাই কেবল একটি দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প নয়। এটি প্রেম, প্রতারণা, ক্ষমতা এবং মানবজীবনের অসংগতি নিয়ে এক গভীর দর্শন। লোকবিশ্বাসের আড়ালে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সত্যকে উদঘাটন করার মাধ্যমে গল্পটি একাধারে শিল্পিত এবং চিন্তাপ্রবণ হয়ে উঠেছে।

শহীদুল জহিরের 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি তাঁর রচনাশৈলীর অনন্য নিদর্শন। তরমুজকে কেন্দ্র করে গল্পের যে প্রবহমানতা, তা আসলে শিল্প, শ্রম এবং সময়ের অমোঘ গতিপথের প্রতীক। গল্পটি দক্ষিণ মৈশুন্দি এলাকার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, যেখানে মহল্লার মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের শিল্পায়নের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গল্পের শুরুতে লেখক যে গ্রীষ্মের তরমুজ খাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তা শুধু খাদ্যাভ্যাসের সচেতনতার বিষয় নয়, বরং এটি মহল্লার শিল্পচেতনার বীজ। হাজি আবদুর রশিদের মৃত্যুশয্যায় তরমুজ চাওয়ার দৃশ্য থেকে দক্ষিণ মৈশুন্দির ফুড ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার যে গল্প উঠে আসে, তা আসলে বাংলাদেশের গ্রামীণ শিল্পায়নের একটি বৃহত্তর রূপক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজি আবদুর রশিদ এবং তার বড়োছেলে হাজি রইসুদ্দিন, যারা দক্ষিণ মৈশুন্দি এলাকার কুটির শিল্পের পথিকৃৎ। হাজি আবদুর রশিদের মৃত্যুশয্যায় তরমুজ চাওয়া এবং সেই থেকে শিল্পের ধারণা তৈরি করার বিষয়টি মানবীয় প্রবৃত্তি, কর্মচেতনা এবং সময়ের তাগিদের এক অপূর্ব মিশ্রণ। লেখকের ব্যঙ্গাত্মক অথচ গভীর বর্ণনায় হাজি রশিদের সচেতনতা এবং সৃষ্টিশীল মানসিকতা মহল্লার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচক হিসেবে ফুটে উঠেছে। গল্পে ইতিহাস এবং সময় একটি শক্তিশালী উপস্থিতি হিসেবে কাজ করেছে। লেখক ক্রমাগত বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে চলাচল করে দেখিয়েছেন, কুটির শিল্প কেবল একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি মহল্লার মানুষের জীবন, শ্রম, এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কাল বা সময় একটি গল্পে একটি নিয়ন্ত্রণহীন শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ গল্পে সময়ের প্রবাহ মানুষকে যেমন কর্মে প্ররোচিত করে, তেমনি তাদের স্মৃতি ও বোধকে পুনরুজ্জীবিত করে। তরমুজ এখানে শুধু একটি ফল নয়, এটি মহল্লার মানুষের সংগ্রাম, সৃষ্টিশীলতা এবং শ্রমের প্রতীক। তরমুজকে কেন্দ্র করে হাজি

ফুড প্রডাক্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, শিল্পায়নের প্রসার এবং মহল্লার স্মৃতি-ঐতিহ্য নতুন এক মাত্রা পেয়েছে। লেদ মেশিনের আওয়াজ, কারখানার গতি, এবং ফ্যাক্টরির কার্যক্রম সবই যেন সেই তরমুজের রূপকথার বিস্তৃতি। গল্পটি শিল্পায়ন এবং সময়ের এক চিরন্তন আখ্যান। শহীদুল জহির অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ব্যঙ্গধর্মী ভাষায় দেখিয়েছেন কীভাবে এক সাধারণ মহল্লার মানুষ তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে প্রেরণা নিয়ে বৃহত্তর শিল্পায়নের পথ তৈরি করে। এটি কেবল একটি গল্প নয়, এটি কর্মচেতনা, শ্রমের মূল্য, এবং গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক সংগ্রামের এক বাস্তবচিত্র।

শহীদুল জহিরের সাহিত্যিক অভিযাত্রার পথ ধরলে, তাঁর সৃষ্টিশীলতার তিনটি নির্দিষ্ট দিক লক্ষ করা যায়। প্রথমত, প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের অনুপুঙ্খ চিত্রণ; দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের আদানপ্রদানের কাব্যিক বিশ্লেষণ; আর তৃতীয়ত, উত্তর-আধুনিক রচনাশৈলী ও ভাষ্যের নতুন আঙ্গিকের প্রতি নিরন্তর অনুসন্ধান। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। কিন্তু শহীদুল জহির সেই গৌরবগাথা সাজাতে গিয়ে আবেগের প্লাবনে ভাসেননি। তাঁর গদ্যের মিতব্যয়ী ক্যানভাসে মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো যেন নিঃশব্দে বেঁচে থাকে। তিনি লিখেছেন সেই সংগ্রামের কথা, যা কেবল অস্ত্রের নয়, আত্মারও। তাঁর চরিত্রগুলো তাই জীবনের কেন্দ্র কিংবা প্রান্তে, সবখানেই মানবিকতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। কেউ বিপন্ন, কেউ মুক্তিপ্রত্যাশী; তবুও তারা সবাই নিজের এবং অন্যের অস্তিত্বের জন্য সদা সচেতন, সদা সংগ্রামী। শহীদুল জহিরের বয়ানে প্রান্তিক মানুষের সাহসিকতা জীবন্ত ছবি হয়ে ধরা দেয়। তোরাপ সেখ, আবদুল করিম, কিংবা মোহাব্বত আলি জাদুগির—তাঁর চরিত্ররা যেন জীবন-সংগ্রামের প্রতীক। তারা কেবল গল্পের পাতায় নয়, বাস্তবতার সীমানায়ও যেন দাঁড়িয়ে থাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পর তিনিই এমন এক কথাশিল্পী, যিনি প্রান্ত ও কেন্দ্রের জীবনযাত্রাকে একই সূত্রে গেঁথেছেন। তাঁর কলমে কেবল বাংলাদেশের গল্প নয়, সমগ্র বাংলাদেশই নিজের নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

সুত্রনির্দেশ:

১. আবদুর রশীদ, মোহাম্মদ, (২০১৩), (সম্পা.), *শহীদুল জহির সমগ্র,* পাঠক সমাবেশ, পৃ. ৯৮৫।
২. *তদেব,* পৃ. ২২।
৩. *তদেব,* পৃ. ২২।
৪. *তদেব,* পৃ. ২৩।
৫. *তদেব,* পৃ. ২৫।
৬. *তদেব,* পৃ. ২৬।
৭. *তদেব,* পৃ. ২৯।
৮. *তদেব,* পৃ. ৪৩।
৯. *তদেব,* পৃ. ৪৬।
১০. *তদেব,* পৃ. ৮৮।
১১. *তদেব,* পৃ. ৮৯।
১২. *তদেব,* পৃ. ৯৮।
১৩. *তদেব,* পৃ. ২০৯।
১৪. *তদেব,* পৃ. ২৩২।